Euthanasia: Killing in the Guise of Relief

স্বস্তিমৃত্যু: স্বস্তির আড়ালে হত্যা

Research Review Journal of Interdisciplinary Studies
double-blind peer-reviewed and refereed online quarterly Journal
ISSN (online): 3108-0472
1(1) 37-42, 2025
©The Author(s) 2025
10.31305/rrjis.2025.v1.n1.006
https://rrjournals.in/

Received: 21 Mar, 2025
Revised: 12 Apr, 2025
Accepted: 19 May, 2025
Published: 30 Jun, 2025

*Avijit Maji

Ex-Student, Bankura University

Abstract: *Euthanasia remains one of the most debated issues in practical ethics, with countries such as Belgium, the Netherlands, Switzerland, and Canada permitting it under specific conditions, while India allows limited forms of passive euthanasia. Literally meaning "good death," euthanasia refers to ending the life of a terminally ill patient to relieve unbearable suffering, typically with medical assistance and consent. However, defining euthanasia as a painless death raises ethical concerns, as similar acts could be misused for personal interests. While it is often justified as an act of compassion for patients with incurable diseases and intolerable pain, its moral acceptability remains contested. There is a significant risk of misuse, where individuals may exploit legal provisions for personal gain under the guise of relief. From an Indian philosophical perspective, euthanasia is largely incompatible with doctrines such as karmavāda and rebirth, which emphasize the completion of one's karmic cycle. Ending life prematurely may interrupt this process. Furthermore, euthanasia can be viewed as reflecting limitations of medical science, where death becomes a substitute for care. This raises critical questions regarding authority, ethical standards, and the physician's role, ultimately challenging whether euthanasia represents genuine relief or concealed moral wrongdoing.*

Keywords: *Euthanasia, Killing, Voluntary Euthanasia, Spina Bifida, janmāntaravāda*

Abstract in Bengali Language: *ইউথানেশিয়া বা দয়া-মৃত্যু বাস্তব নৈতিকতার অন্যতম বিতর্কিত বিষয়। বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড ও কানাডার মতো দেশগুলো নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে এটি বৈধ করেছে, আর ভারতে সীমিত আকারে প্যাসিভ ইউথানেশিয়া অনুমোদিত। আক্ষরিক অর্থে "ভালো মৃত্যু" বোঝালেও, ইউথানেশিয়া বলতে সাধারণত অসহনীয় যন্ত্রণায় ভোগা মরণাপন্ন রোগীর জীবন ইচ্ছাকৃতভাবে শেষ করা বোঝায়, যা সাধারণত চিকিৎসকের সহায়তা ও রোগীর সম্মতিতে করা হয়। তবে ইউথানেশিয়াকে কেবল ব্যথাহীন মৃত্যু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করলে নৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হয়, কারণ একই ধরনের কাজ ব্যক্তিগত স্বার্থে অপব্যবহার হতে পারে। যদিও এটি প্রায়ই নিরাময়-অযোগ্য রোগে আক্রান্ত ও অসহনীয় যন্ত্রণায় ভোগা রোগীদের প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়, তবুও এর নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে। আইনের*

*Corresponding Author
Avijit Maji, Ex-Student, Bankura University
majiavijit37@gmail.com

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License (http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-Commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed.

Scan and Access

সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত লাভের জন্য এর অপব্যবহারের আশঙ্কাও প্রবল। ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইউথানেশিয়া মূলত কর্মবাদ (কর্মবাদ) ও জন্মান্তরবাদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে জীবনের পূর্ণ কর্মফল ভোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অকাল মৃত্যু সেই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে। এছাড়া ইউথানেশিয়াকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন হিসেবেও দেখা যায়, যেখানে যত্নের পরিবর্তে মৃত্যু একটি বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ক্ষমতা, নৈতিক মানদণ্ড এবং চিকিৎসকের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে, এবং শেষ পর্যন্ত এটি সত্যিকারের মুক্তি নাকি আড়াল করা নৈতিক অপরাধ—তা নিয়ে গভীর সংশয় সৃষ্টি করে।

Keywords: *ইউথানেশিয়া, হত্যা, স্বেচ্ছা ইউথানেশিয়া, স্পাইনা বিফিডা, জন্মান্তরবাদ*

স্বস্তিমৃত্যু বিষয়টি ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। জ্যামস র‍্যাচেলস, ফিলিপ্পা ফুট থেকে শুরু করে পিটার সিঙ্গার প্রমুখ বহু প্রথম সারির দার্শনিক স্বস্তিমৃত্যু সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। সম্প্রতিকালে স্বস্তিমৃত্যু Biomedical Ethics চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও বা আত্মহত্যা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয় তথাপি বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে স্বস্তিমৃত্যু অনেকেই সমর্থন করেন। বর্তমানে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, কানাডা সহ বহু দেশ স্বস্তিমৃত্যুকে আইনের স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও তা শর্ত সাপেক্ষ। ভারতও নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুকে সমর্থন করে। এখন প্রশ্ন হল স্বস্তিমৃত্যু বিষয়টি কি? স্বস্তিমৃত্যু বা Euthanasia শব্দটির অর্থ হল Good Death বা A Gentle and Easy Death যার অর্থ হল শান্ত সহজ মৃত্যু (Mercy killing)[1]। কিন্তু সমস্যা হল স্বস্তিমৃত্যুর এরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করলে যা স্বস্তিমৃত্যুর ঘটনা নয় তাকে স্বস্তিমৃত্যু বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। কেননা কোনো খুনি বা অসাধু ব্যক্তি তার স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে বুদ্ধি খাটিয়ে যন্ত্রনাহীন শান্ত এবং সহজভাবে হত্যা করতে পারে, যেখানে হতভাগ্য মানুষটি বিন্দুমাত্র মৃত্যুযন্ত্রনাভোগ করেনি। এক্ষেত্রে উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে এই ঘটনাটিকে স্বস্তিমৃত্যু বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এই ঘটনাকে খুন না বলে স্বস্তিমৃত্যু বলবে এমন নির্বোধ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। আসলে এক্ষেত্রে আমাদের যেটা লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল যে, মৃত্যুকামী ব্যক্তিটি মরে বাঁচছে কি না। সুতরাং স্বস্তিমৃত্যু বলতে তাকেই বুঝব যেখানে কোনো ব্যক্তি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত যা নিরাময় অসম্ভব এবং যার দুর্দশা তার পরিবার তথা আত্মীয় স্বজন চোখে দেখতে পারে না এবং বেঁচে থাকা তার পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। প্রতিমুহূর্তে তার মনে হয় এইরূপ জ্বালা যন্ত্রনা ভোগ করার থেকে মৃত্যুই তার কাছে শ্রেয়। এমত পরিস্থিতে ঐ রুগী এবং তার পরিবারের সম্মতি সহকারে চিকিৎসকের সহায়তায় ঐ ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানোকে স্বস্তিমৃত্যু বলা হয়।

বলা বাহুল্য যে, প্রাচীন গ্রীস দেশে সেইসব ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো হত যারা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং যাদের রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করার অর্থ পরিবার তথা রাষ্ট্রের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া এবং যে ব্যক্তির রাষ্ট্রকে দেওয়ার মত আর কিছুই থাকে না। তবে ঐ ব্যক্তির স্বার্থে মৃত্যু ঘটনা হত কি না সেটা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু এরূপ ব্যক্তির মৃত্য ঘটানো হত রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা ভেবেই, যেখানে ঐ ব্যক্তির দ্বারা কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না।

একটি দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৫ ই জানুয়ারী, ২০২০ আমি একটি খবর পড়েছিলাম, যেখানে ওড়িষ্যার গাঞ্জাম জেলার জগন্নাথ প্রধান নামে ১০ বছর বয়সের একটি শিশু এক বিরল চর্মরোগে আক্রান্ত, ডাক্তারি পরিভাষায় যার নাম ল্যামেলার ইচথিয়োসিস।[২] শিশুটি আর পাঁচটা সাধারণ শিশুর মত নয়। তার অদ্ভুত চেহেরা মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারে। ঐ শিশুটি প্রতি ছয় মাস অন্তর সাপের মত খোলস ত্যাগ করে। কয়েক বছর আগে থেকেই শীশুটি এই রোগে আক্রান্ত। ধীরে ধীরে তার চামড়া শুষ্ক হতে থাকে; একটা সময় তার চামড়া শুষ্ক হতে হতে সাপের খোলসের ন্যায় উঠে যায়। একসময় বিষয়টি এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে, তার নড়াচড়া করার অবস্থা পর্যন্ত থাকে না। তার কষ্ট লাঘবের জন্য বা সাময়িক স্বস্তির জন্য কিছু মশ্চারাইজার ক্রিম ব্যবহার করা হলেও পুনরায় পূর্বের অবস্থাতেই ফিরে যেতে হয়। যখন চামড়া ওঠে তখন সে নড়াচড়া করতে পারে না এমনকি চোখের পলকও ফেলতে পারে না। ডাক্তাররা অপারক হওয়ায় পরিবারকে পরামর্শ দেয় বাইরে গিয়ে উন্নত চিকিৎসা করাই একমাত্র উপায়। কিন্তু পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল না হওয়ায় দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ঐ শিশুটির চোখের জল ফেলা আর তার কষ্ট যন্ত্রনা দেখা ছাড়া পরিবারেরও কোনো উপায় থাকে না। তাছাড়া আমরা আজকাল প্রায়শই ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার খবর দেখতে পাই। যার থেকে মুক্তির না থাকে কোনো উপায় আর না থাকে চিকিৎসা চালানোর সামর্থ্য। এই সমস্ত বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হলে আমরা মনে করি ঐ সব ব্যক্তির দীর্ঘ যন্ত্রনাময় জীবন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তার জীবনের অবসান ঘটানোয় শ্রেয়।

আরেকটা দৃষ্টান্তের কথা বলি, যার উল্লেখ করেছেন জ্যামস র‍্যাচেলস তাঁর অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ইউথানাসিয়া নামক প্রবন্ধে। মানুষ যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণার শেষ সিমানায় উপস্থিত হয় তখন তার কীরূপ মানসিক অবস্থা হয় তার বর্ণনা করেছেন র‍্যাচেলস। এক ক্যান্সার আক্রান্ত সাংবাদিক যিনি ঘটনাচক্রে অপর আরেকজন ক্যান্সার রুগীর সাথে ছিলেন, যে রুগীর সাথে তাকে থাকতে হয়েছিল তার নাম জ্যাক। সাংবাদিকের কথায়, জ্যাকের পেটে এক বিশাল আকারের টিউমার ছিল, যা ক্যান্সারে আক্রান্ত। তার ক্যান্সার এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছিল যে, অস্ত্রপাচারের দ্বারা তার টিউমার অপসারণ করলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য। চিকিৎসকেরা জ্যাকের কষ্ট সাময়িকভাবে দূর করার জন্য চার ঘন্টা অন্তর ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা করেন। যা ব্যায়বহুল এবং ঐ ইঞ্জেকশনের ফলে তার যন্ত্রনা মাত্র দুই ঘন্টার জন্য লাঘব হত। এবং পরবর্তী ইঞ্জেকশনের জন্য আরও দুই ঘন্টা অপেক্ষা করতে হত। এই দুই ঘন্টা সময় কাটানো জ্যাকের জন্য দুর্বিসহ হয়ে উঠত। সে প্রথম কিছুক্ষন মৃদুভাবে আর্তনাদ করে কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করত। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে সে উন্মত্ত কুকুরের মত চিৎকার করত। চিকিৎসক বা নার্সদের শান্তনা কোনোভাবেই তাকে শান্ত করতে পারত না। সে ততক্ষণ চিৎকার করত যতক্ষণ না পর্যন্ত পরবর্তী ইঞ্জেকশনের সময় আসে। এইভাবে দুই দিন দেখার পর তৃতীয় দিনে সাংবাদিক চিন্তা করলেন যে জ্যাক যদি মানুষ না হয়ে একটা কুকুর হত তাহলে তিনি কি করতেন? অবষ্যই ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে হত্যা করতেন। সামান্য করুণা যদি কোনো মানুষের মধ্যে থেকে থাকে তাহলে কখনোই সে এই ধরণের নির্বিকার একটি প্রাণির কষ্ট দেখতে পারবেন না। কারণ তাতে কারোরই মঙ্গল নেই।[৩] এমত পরিস্থিতিতে আমাদের কি মনে হয় না জ্যাকের ক্ষেত্রের অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ। এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে মানুষ উপলব্ধি করে যে প্রাণধারণই জীবনের পরম প্রাপ্তি নয়, বরং জীবন থেকে মুক্তিই তাঁদের কাছে আশির্বাদ।

এ তো গেল স্বস্তিমৃত্যুর স্বপক্ষের দিক। কিন্তু স্বস্তিমৃত্যুর বা কৃপাহত্যার কি যথার্থই প্রয়োজন আছে? না কি স্বস্তিমৃত্যুর প্রয়োগে মানুষের স্বস্তি বা মুক্তির সুযোগ নিয়ে কেউ তার চরিতার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এর অপপ্রয়োগ চালাতে পারে। অর্থাৎ আইনের সহায়তায় কেউ তার অপপ্রয়োগ করতে বা হত্যালীলা চালাতে স্বস্তিমৃত্যুকে হাতিয়ার করতে পারে। আজকের আলোচ্য বিষয় হল স্বস্তিমৃত্যু কি সত্যি সত্যিই স্বস্তির না কি স্বস্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে হত্যা, মুক্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে ব্যর্থতা। তাছাড়া কেউ কেউ মনে করতেই পারেন যে, যে জীবন আমরা দিতে পারি না সে জীবন নেওয়ার অধিকারও আমাদের নেই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"[৪] সুতরাং যেখানে মানুষের বাঁচার ইচ্ছা থাকে সেখানে স্বস্তিমৃত্যুর প্রশ্নই ওঠে না। শষ্য-শ্যামলা এই সুন্দর পৃথিবীকে কেই বা ছেড়ে যেতে চায়। তবে এই আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে স্বস্তিমৃত্যুর প্রকারভেদ সম্পর্কে দু এককথা বলা প্রয়োজন। রোগির সম্মতির ভিত্তিতে পিটার সিঙ্গার স্বস্তিমৃত্যুকে মূলত তিনভাগে ভাগ করেছেন – ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু, অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু এবং ইচ্ছা নিরপেক্ষ স্বস্তিমৃত্যু।[৫] আবার সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভেদে আরও দুই ধরণের স্বস্তিমৃত্যুর কথাও পাওয়া যায়। এই বিভাগটি করা হয় মৃত্যু ঘটানোর উপায় বা প্রকরণ ভেদে।

ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুঃ যখন কোনো ব্যক্তি এমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত যে সেই অসহনীয় যন্ত্রনাভোগ তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে, এইমত পরিস্থিতিতে ঐ ব্যক্তি যদি তার পরিবারের নিকট এবং চিকিৎসকের নিকট মৃত্যু প্রার্থনা করে এবং ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো হয় তাহলে এই ধরণের কৃপাহত্যাকে ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু বলা হয়। পিটার সিঙ্গার তার Practical Ethics নামক গ্রন্থে একটি দৃষ্টান্তে উল্লেখ করেন, যেখানে ড্যারেক হাস্ক্রি নামক এক ব্যক্তি তাঁর ক্যান্সারে আক্রান্ত স্ত্রীকে তারই অনুরোধে তার দুর্বিসহ জীবনের ইতি টেনে দেন কিছু প্রাণঘাতী ঔষধ দিয়ে। সিঙ্গারের আরেকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৭৩ খীষ্টাব্দে জর্জ ঝিগম্যানিয়াক নামক নিউ জার্সির বাসিন্দা এক ব্যক্তি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়। এবং তার ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর বিকল হয়ে যায় এবং সে প্রচণ্ড যন্ত্রনা অনুভব করতে থাকে। তাছাড়া শ্বাস প্রশ্বাস সচল রাখার জন্য চিকিৎসকেরা অস্ত্রপ্রচারের ফলে সে তার বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। এই পরিস্থিতিতে সে বেঁচে থাকতে চায়নি। সে তার ভাই লিস্টার এবং ডাক্তারের কাছে মৃত্যু কামনা করে। লিস্টার ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে জানতে পারে যে, জর্জের সেরে ওঠার কনো সম্ভাবনা নেই। এরপর লিস্টার এক চোরায় বন্ধুক নিয়ে হাস্পাতালে প্রবেশ করে এবং জর্জের কাছে জানতে চায় যে, সে জর্জের জীবনের ইতি টানতে প্রস্তুত। জর্জ তুমি কি চাও আমি তোমাকে গুলি করে হত্যা করি? জর্জ ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি দেওয়ার সাথে সাথে লিস্টার জর্জকে গুলি করে মেরে ফেলে।[৬] যদিও এটি একটি ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর দৃষ্টান্ত তথাপি এখানে মৃত্যু নামক ঘটনাটি কিছু নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। মৃত্যু ঘটানোর জন্য চকিৎসকের সাহায্য দরকার ছিল এবং মৃত্যুটি আরও যন্ত্রনাহীন হতে পারত।

অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুঃ এই ধরণের স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে রুগীর স্বস্তিমৃত্যুর প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার মত অবস্থা থাকে কিন্তু তার থেকে কোনোরূপ সম্মতি আসে না। সিঙ্গারের মতে এর দুটি কারণ হতে পারে। কেউ রুগীর নিকট প্রস্তাব রাখেনি অথবা তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সে সেই

প্রস্তাবে সায় দেয়নি। এই ধরণের রুগীর স্বস্তিমৃত্যু ঘটানোকে অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু বলা হয়। অনেক সময় কোনো ব্যক্তি এমন অনারোগ্য ব্যাধিতে জর্জরিত যে, তার শেষ কয়েকদিন চোখে দেখার মত নয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও হয়ত বা রুগী স্বস্তিমৃত্যুর প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি, সেক্ষেত্রে রুগীর কথা ভেবে কেউ তার এই দুর্ভার যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য স্বস্তিমৃত্যু দিতে পারেন। তবে সিঙ্গারের মতে এই ধরণের দৃষ্টান্ত বাস্তবে বিরল।

ইচ্ছা-নিরপেক্ষ স্বস্তিমৃত্যুঃ যেক্ষেত্রে সম্মতি জানাতে অসমর্থ কোনো শিশু বা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী, বাক্‌শক্তিহীন কোনো রুগী অথবা জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ কোনো রুগী যে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে অক্ষম। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনোটিকে বেছে নেওয়ার সামর্থ্য থাকে না এমন রুগীর স্বস্তিমৃত্যু ঘটানো হলে সেক্ষত্রে এরূপ স্বস্তিমৃত্যুকে বলা হবে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ স্বস্তিমৃত্যু। পিটার সিঙ্গার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। এক ব্যক্তির এক পুত্র জন্ম থেকেই শয্যাশয়ী ছিল। শৈশবেই সে তার দৃষ্টিশক্তি হারায়, এমনকি সে কথা বলতে পারত না, হাটতে পারত না। পিতার কাছে শিশুটি ছিল মৃত। কারণ সে কোনো কাজ করতে অক্ষম ছিল, তাই শিশুটির এরূপ দুর্বিসহ জীবনের অবসান ঘটানোর জন্য শিশুটির পিতা ক্লোরোফর্ম দিয়ে শিশুটিকে হত্যা করেন।

সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুঃ কোনো ব্যক্তি যখন অনারোগ্য ব্যাধিতে জর্জরিত তখন সরাসরি তার জীবনের অবসান ঘটানোর জন্য তাকে প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশন বা ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। এই ধরণের কৃপাহত্যাকে বলা হয় সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু। উপোরোক্ত স্বস্তিমৃত্যুর বিভাগগুলি প্রত্যেকটিই সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে যেহেতু এখানে রোগীর যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য সরাসরি তার মৃত্যু ঘটানো হয়। অনেক দেশেই সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু আইনত অপরাধ।

নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুঃ এক্ষেত্রে রোগীর যেকোনোরূপ চিকিৎসা তুলে নেওয়া হয়। এরকম স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ কোনো কর্মের ভূমিকা থাকে না। এখানে রোগীর চিকিৎসাকে প্রত্যাহার করে তার মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করা হয়। পিটার সিঙ্গার তার Practical Ethics গ্রন্থে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন স্পাইনা বাইফিডা রোগে আক্রান্ত শিশুরা জন্ম নিত শরীরের পিছনের দিকে একটা গর্ত নিয়ে, যেখান দিয়ে তাদের স্পাইনাল কর্ড বেরিয়ে আসত। এই রোগে শিশুরা বেশীদিন বাঁচত না। ১৯৫৭ সাল নাগাদ আমেরিকার চিকিৎসকরা স্পাইনা বাইফিডা রোগের চিকিৎসার জন্য হোল্টার ভাল্‌ভ যন্ত্রের ব্যবহার করেন। এর ফলে এই রোগে শিশুদের মৃত্যুর হার অনেক কমে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু যারা বাঁচছিল তারা একরকম নিদারুণ ভাবে বাঁচছিল। এবং তাদের শরীরের উপর কোনো নিয়ন্ত্রন ছিল না। বেশীরভাগ শিশুই প্যারালিসিসের শিকার হত এবং তাদের মলমুত্র ত্যাগের উপরও কোনো নিয়ন্ত্রন ছিল না। এমন কি হোল্টার ভাল্‌ভ যন্ত্রটিকে সক্রিয় রাখার জন্য বার বার অস্ত্রপ্রচার করতে হত। এই অসহনীয় অবস্থা দেখে জন লোরবার নামক এক ব্রিটিশ চিকিৎসক প্রস্তাব দেন যে স্পাইনা বাইফিডা রোগে আক্রান্ত সকল শিশুদের চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। যে সমস্ত শিশুদের ত্রুটি তুলনামূলক কম তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হোক। এবং বাকিদের এই পদ্ধতি থেকে প্রত্যাহার করা হোক। যারা এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের মৃত্যু কিছু দিনের মধ্যেই নিশ্চিত হয়।[৭] এই ধরণের মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে যেহেতু সেরকম কোনো সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া হয় না তাই এই ধরণের মৃত্যুকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু। ভারত সহ আরও অনেক দেশে নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুকে আইনের স্বীকৃতি দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল যে, স্বস্তিমৃত্যুর কি বাস্তবিকই আইনি স্বীকৃতির প্রয়োজনিয়তা রয়েছে? যদি স্বস্তিমৃত্যুকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে বাস্তবে এর অপপ্রয়োগ হবে না তো? স্বস্তিমৃত্যুর অন্তরালে কোনো অসাধু ব্যক্তির হত্যালীলা চালাতে সুবিধা করে দেওয়া হবে না তো? আবার যদি কোনো ব্যক্তির স্বস্তিমৃত্যু ঘটানো হয় সেখানে হয়ত দেখা যেতে পারে যে, চিকিৎসক রোগীকে যে অনারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বলে মনে করছেন বাস্তবে হয়ত সেই রোগীর রোগ নিরাময় সম্ভব অথবা আজ যাকে অনারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বলে স্বস্তিমৃত্যু দেওয়া হল আগামীকাল অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বা প্রযুক্তির উন্নতির ফলে এমন কিছু আবিষ্কৃত হল যার রোগ নিরাময় সম্ভব। সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির স্বস্তিমৃত্যু ঘটানো কতটা যুক্তিযুক্ত সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ মৃত্যুর মত একটি ঘটনা যখন ঘটে যায় তখন তার থেকে ফিরে আসার কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং মৃত্যুর মতো ঘটনাটিকে ঘটানোর পূর্বে স্বস্তিমৃত্যু কতটা যুক্তিযুক্ত সেই বিষয়ে বিচার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, স্বস্তিমৃত্যুকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া উচিৎ তথাপি কোনো এক ব্যক্তি কোনো অনারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও সে বাঁচতে চায়। হয়ত বা তার রোগ নিরাময়ও সম্ভব কিন্তু সাময়িকভাবে ঐ ব্যক্তি যন্ত্রণাক্লিষ্ট। এখন ঐ ব্যক্তির ভাই বা নিকট আত্মীয় যদি সম্পত্তি লাভের আশায় চিকিৎসককে ঘুষ খাইয়ে ঐ রোগীকে রোগ যন্ত্রণার বিভিন্ন ভয় দেখিয়ে তার হত্যা করায় যে ঘটনাকে স্বস্তিমৃত্যুর ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে স্বস্তিমৃত্যুর সমর্থন যোগ্যতার মধ্যে সত্যিই কি কোনো স্বস্তি পাওয়া যায়; যায় না বরং একে

পরিকল্পনামাফিক হত্যা বলাই শ্রেয়; যার হাতিয়ার স্বস্তিমৃত্যু নামক আইনি স্বীকৃতি, যাকে আইনের চোখে অন্যায় বলে গণ্য করা যায় না। স্বস্তিমৃত্যুকে যদি আইনের স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে এই ধরণের ঘটনা যে বাস্তবে ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কেই বা দিতে পারে।

স্বস্তিমৃত্যুকে আইনের স্বীকৃতি দিলে নিরীহ মানুষের নিধনপর্বও স্বস্তিমৃত্যুর ঘটনা বলে পার পেয়ে যাবে। এমনটাই ঘটেছিল হিটলারের আমলে জার্মানিতে। অধ্যাপক সমনাথ চক্রবর্তীর ভাষায় – "১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে জারি করা এক ডিক্রির বলে হিটলার প্রায় তিন লক্ষ মানুষকে গ্যাস চেম্বারে মরতে পাঠিয়েছিল, শুধু এই যুক্তিতে যে, এরা অনারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। কি ধরণের ব্যাধি? ইতিহাস বলছে এদের মধ্যে অনেকেই ছিল মনোরোগী, কেউ কেউ বার্ধক্যের কারণে অক্ষম, কেউ আবার পারকিনসনে পঙ্গু। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এইসব রোগীদের পক্ষে সুস্থ হয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল তথাপি হিটলার তাদের প্রতি করুণাবশত এই নিধনযজ্ঞের আয়োজন করেছিল এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে হিটলারের কাছে এটা ছিল আগামী দিনের ইহুদী নিধনপর্বের একটা মহড়া বিশেষ।"[৮] সুতরাং Euthanasia কে আইনি স্বীকৃতি দিলে এই ধরণের নিধনপর্ব চলতে থাকবে।

জ্যামস র‍্যাচেলস দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যেগুলোকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় হত্যার উদাহরণ বলা যায় এবং নীতিগতভাবে র‍্যাচেলস দুটি ঘটনায় যে সমানভাবে নিন্দনীয় একথা স্বীকার করেছেন। ঘটনা দুটি এরকম –

১) স্মিথের ছয় বছর বয়স্ক ভাই যদি কোনো কারণে মারা যায় তাহলে স্মিথ প্রচুর সম্পত্তির মালিক হবে। একদিন তার ভাই বাথট্যাবে স্নান করছিল তখন স্মিথ স্নানের ঘরে ঢুকে তাকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলে এবং ব্যাপারটিকে এমনভাবে সাজায় যাতে মৃত্যুটি একটি আকশ্মিক দুর্ঘটনা বলে মনে হয়।

২) জোন্সের ছয় বছর বয়স্ক ভাই যদি কোনো কারণে মারা যায় তাহলে স্মিথের ন্যায় জোন্সও প্রচুর সম্পত্তির মালিক হবে। স্মিথের মতো জোন্সও শিশুটিকে জলে ডুবিয়ে মারার প্ল্যান করেছিল। কিন্তু স্নানের ঘরে ঢুকে দেখে যে, শিশুটি কোনোভাবে পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে জলে ডুবে গেল। জোন্স তাকে ডোবাবার চেষ্টা না করলেও, তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি। শিশুটি নিজেই জলে ডুবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেল আর জোন্স নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসেবে এই দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করল।[৯]

এই দুই ঘটনাই সমানভাবে অপরাধযোগ্য ও নীতিগতভাবে নিন্দনীয়। ঘটনা দুটির মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, স্মিথ শিশুটিকে হত্যা করল আর জোন্স শিশুটিকে মরতে দিল। র‍্যাচেলস র মতে স্মিথ ও জোন্স দুজনেরই অভিপ্রায় সমান এবং মানুষ হিসেবে স্মিথ ও জোন্স দুজনকেই নিকৃষ্ট বলা যায়। যদিও জোন্স আত্মপক্ষ সমর্থনে বলতেই পারে যে, সে তো শিশুটিকে হত্যা করেনি, কেবল নিরব দর্শক হিসেবে মরতে দেখেছে মাত্র। কিন্তু এটি নৈতিক যুক্তির এক বিকৃত দৃষ্টান্ত মাত্র। জোন্স আত্মপক্ষ সমর্থনে এরকম যুক্তি দিতে পারে না এবং নিজেকে শিশুটির মৃত্যুর দায় থেকে মুক্ত করতে পারে না। কেননা তারও অভিপ্রায় ছিল শিশুটিকে খুন করা। যদিও এই দৃষ্টান্ত দুটিকে স্বস্তিমৃত্যুর দৃষ্টান্ত বলা যায় না। কেননা স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাভের বা সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর জীবন নাশের কোনো প্রসঙ্গ থাকে না। তবে স্বস্তিমৃত্যুর সঙ্গে এই ঘটনা দুটির মিল আছে।

আবার আমরা যদি ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টিভিঙ্গী থেকে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, ভারতীয় চিন্তাধারা কোনোভাবেই স্বস্তিমৃত্যু নামক হত্যাকে মদত দেয়না। একমাত্র নাস্তিক চার্বাক সম্প্রদায় ছাড়া সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই মোটামুটি কর্মবাদ ও জন্মান্তর্বাদে বিশ্বাসী। কর্মবাদ ও জন্মান্তর্বাদ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল সম্পূর্ণ ভোগ না করা পর্যন্ত পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এখন যদি স্বস্তিমৃত্যু নামক মৃত্যুর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির ইতি টেনে দেওয়া হয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে কর্মফল ভোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার বিরোধী।

আমার মনে হয় স্বস্তিমৃত্যুতে সায় দেওয়ার অর্থ চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে ঢাকার বিরাট এক প্রচেষ্টা মাত্র। দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে এমন রুগীর মৃত্যু ভাবনাকে স্বার্থকতা প্রদানের অন্যতম উপায় হল স্বস্তিমৃত্যু। চিকিৎসাবিজ্ঞান স্বস্তিমৃত্যুর মতো হত্যার আড়ালে নিজ অক্ষমতাকে ঢেকে রেখে রুগীর দুঃখ মুক্তির উপায় হিসেবে তার জীবন হানিকেই বেছে দিচ্ছে। তবে ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে দুঃখ মুক্তির উপায় হিসাবে কখনই মৃত্যুকে সায় দেয়না। বরং তাদের মতে দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় হল আনন্দ যে চিন্তাধারাকে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেছে। কেউ এই দুঃখ মুক্তিকে বলেছেন নির্বান, কেউ কৈবল্য, কেউ অপবর্গ, কেউ নিঃশ্রেয়স, কেউ বা অপূর্ব ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্ন হল কোন্ কোন্ মানদণ্ড পূরিত হলে কোনো ব্যক্তিকে স্বস্তিমৃত্যু দেওয়া যেতে পারে তা নির্ধারণ করবে কে? একটি মানুষের মৃত্যুর মানদণ্ড কি মানুষই নির্ধারণ করবে? একজন চিকিৎসক যেখানে কোনো রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে অক্ষম, তার রোগ নিরাময় করতে অক্ষম সেখানে

ঐ চিকিৎসক ঐ রোগীকে স্বস্তিমৃত্যু নামক মৃত্যু দেওয়ার বেলায় সক্ষম। আমরা আমাদের অক্ষমতা বা সীমাবদ্ধতা জানা সত্ত্বেও অনেক সময় কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েও ঐ পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি। অন্যদিকে স্বস্তিমৃত্যু কিন্তু এজাতীয় ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং বিকল্পহীন এক অসহায় পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়, যেখানে আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মৃত্যুই হল জীবনের অন্তিম পরিণতি। স্বস্তিমৃত্যুর অজুহাতে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক মানুষের সুন্দর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বা ঘটে চলেছে হয়ত বা ভবিষ্যতেও ঘটবে। সুতরাং স্বস্তিমৃত্যুকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বে সব দিক চিন্তা করে মানুষের কথা ভেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় কাম্য। নচেৎ এর অন্তরালে হত্যালীলা কোনোদিনই বন্ধ হবে না।

তথ্যসূত্র

[1] ম্যাটার্স অব্ লাইফ অ্যান্ড ডেথ: নিউ ইন্ট্রদাক্টরি এসেস ইন মোরাল ফিলোসফি, টম এল. বিউচ্যাম্প অ্যান্ড টম রেগান, র‍্যান্ডম হাউস, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা - ৩৫

[2] https://allindiaroundup.com/india/10-year-old-indian-boy-with-extremely-rare-condition-shreds-his-skin-every-month/?utm_source=chatgpt.com

[3] এক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ইউথানাসিয়া, দ্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব্ মেডিশিন, জেমস র‍্যাচেলস, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা – ৭৮-৮০

[4] ‘প্রাণ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[5] প্রাকটিক্যাল এথিক্স, পিটার সিঙ্গার, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ১৭৫

[6] তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৫-১৮০

[7] তদেব, পৃষ্ঠা ২১১-২১২

[8] কথায় কর্মে এথিক্স, সোমনাথ চক্রবর্তী, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৩

[9] এক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ইউথানাসিয়া, দ্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব্ মেডিশিন, জেমস র‍্যাচেলস, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

Cite this article

Maji, A. (2025). Euthanasia: Killing in the Guise of Relief: **স্বস্তিমৃত্যু: স্বস্তির আড়ালে হত্যা.** *Research Review Journal of Interdisciplinary Studies*, *1*(1), 37-42. https://doi.org/10.31305/rrjis.2025.v1.n1.006